বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩২ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২১

বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা নীতির একটি পর্যালোচনা

কাজী সাহাবউদ্দিন*
তাহ্‌রিন তাহ্‌রীমা চৌধুরী**

১। ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনে (structural change) গত চার দশক ধরে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষিক্ষেত্রের ক্রমহ্রাসমান ভূমিকা লক্ষণীয়। মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষির অবদান সত্তর দশকে ছিল ৫০ শতাংশ যা আশির দশকে হ্রাস পেয়ে এক-তৃতীয়াংশে দাঁড়ায়। পরবর্তীতে কৃষির অবদান আরও হ্রাস পেয়ে ১৯৮৯/৯০ সালে ৩০ শতাংশে, ১৯৯৯/০০ সালে ২৫ শতাংশে এবং ২০০৯/১০ সালে ২০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কৃষির এরূপ ক্রমহ্রাসমান অবদান সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন পর্যন্ত কৃষি নির্ভর। মোট শ্রমশক্তির ৪৫ শতাংশের বেশি কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত। অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে কৃষিক্ষেত্রের অবদান অপরিহার্য।

২। বাংলাদেশের কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি এবং কাঠামোগত পরিবর্তন

২.১। কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশের কৃষির মোট উৎপাদনে শস্যের অবদান সর্বাধিক। আশির দশকে কৃষিক্ষেত্রে এর অবদান ছিল প্রায় ৬৫ শতাংশ, যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০০৯/১০ এ প্রায় ৫৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে প্রাণিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ এবং বনজ সম্পদের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ১৯৮০/৮১ সালে কৃষিক্ষেত্রে এ সকল উপখাতের অবদান ছিল ৩৫ শতাংশ, যা ২০০৯/১০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ৪৪ শতাংশ। কৃষিতে প্রাণীজ সম্পদের অবদান বিগত সময়কালে মোটামুটি একই ছিল এবং বনজ সম্পদের অবদান সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব কৃষিক্ষেত্রে বিগত তিন দশকে শস্য উপখাতের অবদান হ্রাস পেলেও মৎস্য উপখাতের অবদান সর্বাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ১)।

সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশে কৃষির প্রবৃদ্ধির হার বিগত দুই দশকে ছিল ৩.৩ শতাংশ, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের (১.৪ শতাংশ) তুলনায় বেশি হলেও জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (৫.৩ শতাংশ) এর চেয়ে তুলনায় কম ছিল। কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি নব্বই দশকের তুলনায় বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে (২০০০/০১-২০০৯/১০) সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। নব্বই দশকের তুলনায় বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে সকল কৃষি উপখাতের (মৎস্য উপখাত ব্যতিত) প্রবৃদ্ধি বেশি ছিল, যা কৃষির প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। মৎস্য খাতের প্রবৃদ্ধি হ্রাস না পেলে কৃষির প্রবৃদ্ধি আরও বেশি হতে পারত বলে ধারণা করা যায়। শস্যক্ষেত্রের প্রবৃদ্ধির হার নব্বই দশকের তুলনায় ২০০০/০১-২০০৯/১০ সময়কালে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্য উপখাতের প্রবৃদ্ধি বিগত দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বৃদ্ধি পেলেও তা নব্বই দশকের প্রবৃদ্ধির চেয়ে কম ছিল (সারণি ২)।

* প্রফেসরিয়াল ফেলো, বিআইডিএস।
** রিসার্চ এসোসিয়েট, বিআইডিএস।

সারণি ১

মোট দেশজ উৎপাদন এবং মোট কৃষিজ উৎপাদনে খাতওয়ারী অবদান (১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে)

(শতাংশ)

	১৯৮০/৮১	১৯৮৯/৯০	১৯৯৯/০০	২০০৯/১০
	জিডিপিতে অবদান			
শস্য এবং শাকসবজি	২১.১	১৮.০	১৪.০	১১.৪
প্রাণী সম্পদ	৪.২	৩.৬	২.৯	২.৬
বনজ সম্পদ	২.২	২.০	১.৮	১.৭
মৎস্য সম্পদ	৪.৭	৪.২	৫.৯	৪.৫
মোট	**৩২.২**	**২৮.৬**	**২৪.৬**	**২০.২**
	কৃষিজ উৎপাদনে অবদান			
শস্য এবং শাকসবজি	৬৫.৬	৬৫.৫	৫৭.১	৫৬.৩
প্রাণী সম্পদ	১৩.০	১২.৬	১১.৮	১৩.১
বনজ সম্পদ	৬.৮	৭.১	৭.৩	৮.৫
মৎস্য সম্পদ	১৪.৬	১৪.৮	২৩.৮	২২.১
মোট	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**

উৎস: বিবিএস এবং লেখকের গণনা।

সারণি ২

বিগত দুই দশকে কৃষিক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির ধারা: ১৯৯০-২০১০

(শতকরা হার)

	১৯৯০/৯১-২০০৯/১০	১৯৯০/৯১-১৯৯৯/০০	২০০০/০১-২০০৯/১০	২০০০/০১-২০০৪/০৫	২০০৫/০৬-২০০৯/১০
কৃষি খাত	৩.৩	৩.০	৩.৬	৩.৫	৪.১
শস্য এবং শাকসবজি	২.৭	১.৫	৩.২	২.১	৫.১
প্রাণী সম্পদ	৩.৬	২.৫	৪.৮	৫.৬	৩.৫
বনজ সম্পদ	৪.৪	৩.৬	৪.৯	৫.৪	৫.৩
মৎস্য সম্পদ	৪.৯	৭.৭	৩.৫	১.৮	৪.১
জিডিপি	৫.৩	৪.৮	৬.১	৬.৪	৫.৯
জনসংখ্যা	১.৪	১.৮	১.২	১.৩	১.৩

উৎস: বিবিএস এবং লেখকের গণনা।
নোট: Semilog function ব্যবহার করে প্রবৃদ্ধির হার নিরূপণ করা হয়েছে।

২.২। বাংলাদেশের কৃষির রূপান্তর : সম্পদের পরিবর্তন

বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে কৃষি শুমারী সম্পাদিত হয়েছে, ১৯৮৩-৮৪, ১৯৯৬ এবং ২০০৮ সালে। কৃষি শুমারী হতে কৃষির সম্পদের পরিমাণ (resource base) এবং উৎপাদন সংগঠনের (organization of production) পরিবর্তনের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা যায়:

- কৃষি খাতে সম্পদের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। মোট আবাদী জমির পরিমাণ ১৯৮৩/৮৪ সালে ছিল ৯.২ মিলিয়ন হেক্টর, যা ১৯৯৬ সালে হ্রাস পেয়ে ৮.২ মিলিয়ন হেক্টরে দাঁড়ায়। বলা যায়, ১৯৮৩/৮৪ হতে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে কৃষি কাজে ব্যবহৃত ৮২,০০০ হেক্টর জমি অকৃষিজ খাতে ব্যবহার হচ্ছে। অকৃষিজ খাতে ব্যবহৃত ১ মিলিয়ন হেক্টর জমির মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটি এবং নগর প্রসার (মোট ৬০৭,০০০ হেক্টর), গ্রামীণ

বসতবাড়ি সংলগ্ন জমি বৃদ্ধি (মোট ১৪২,০০০ হেক্টর), এবং গ্রামীণ রাস্তাঘাট ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন (মোট ২৫২,০০০ হেক্টর) অন্তর্ভুক্ত।[১] ফলে কৃষি জমির গড় আকার ১৯৬০ সালের ১.৭০ হেক্টর থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৮৩-৮৪ সালে ০.৯১ হেক্টর, ১৯৯৬ সালে ০.৬৮ হেক্টর এবং ২০০৮ সালে ০.৪০ হেক্টরে দাঁড়িয়েছে।

- কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমিকের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। কৃষিনির্ভর পরিবারের সংখ্যা ১৯৮৩-৮৪ সালের ১০ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালে ১১.৮ মিলিয়ন এবং ২০০৮ সালে ১৪.৯ মিলিয়নে দাঁড়ায়। মোট গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে অকৃষিজ পরিবারের অংশ ১৯৮৩-৮৪ সালে ছিল ২৭ শতাংশ, যা ২০০৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪২ শতাংশে। অন্যের জমিতে কৃষিশ্রমে নিয়োজিত পরিবারের সংখ্যা মোট গ্রামীণ পরিবারের ১৯৮৩-৮৪ সালে ২২.৬ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৬ তে ১৬.৯ শতাংশে এবং ২০০৮ সালে ৯.৬ শতাংশে দাঁড়ায়। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শহরে অভিবাসনের পাশাপাশি কৃষি হতে অকৃষিজ পেশায় অংশগ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত জমি ও শ্রম অধিক উৎপাদনশীল অকৃষিজ খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা সামগ্রিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করছে। এই রূপান্তরের ফলস্বরূপ কৃষিতে জমি ও শ্রমের উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়েছে (Hossain 2000)।

- কৃষিক্ষেত্রে মূলধনের পরিমাণ গত তিন দশকে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের ক্রমবৃদ্ধিতে ক্ষুদ্রায়তন সেচ ব্যবস্থায় বেসরকারি বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সেচ যন্ত্রপাতির মালিকানা সম্পন্ন গ্রামীণ পরিবারের সংখ্যা ১৯৮৩-৮৪ সালের ২৭৪,০০০ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ তে ৯৩৩,০০০ দাঁড়ায়। গ্রামীণ পরিবারের মালিকানাধীন সেচ যন্ত্রপাতির মোট পরিমাণ ১৯৮৩-৮৪ সালের ৩.১২ লাখ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালে দাঁড়ায় ১১ লাখে। আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সেচকৃত মোট আবাদী জমির পরিমাণ ১৯৮৩-৮৪ সালের ২০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬-৯৭ সালে ৪৮ শতাংশে এবং ২০০৮ সালে ৬৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পাওয়ার টিলার ও ট্রাক্টরের মালিকানা সম্পন্ন মোট পরিবারের সংখ্যা ১৯৮৩-৮৪ সালে ছিল ২৭,০০০, যা ১৯৯৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৪১,০০০ এবং ২০০৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৬২,৬১৮। কৃষিক্ষেত্রে শ্রমের পরিবর্তে মূলধনের ব্যবহারের ফলে শ্রমের উৎপাদশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষিতে মজুরি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।

২.৩। বাংলাদেশের কৃষির রূপান্তর: উৎপাদন সংগঠনের পরিবর্তন

- জনসংখ্যার আধিক্য এবং ভূমির স্বল্পতার কারণে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। দশ হেক্টর (২৪.৭ একর) জমির মালিকানা সম্পন্ন মোট পরিবারের সংখ্যা ১৯৮৩-৮৪ সালে ছিল ২৪,০০০, যা ১৯৯৬ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৯,০০০ এবং ২০০৮ সালে হ্রাস পেয়ে হয় ১৩,৭২১। ১৯৮৩-৮৪ সালে প্রায় ৫৪ লাখ

[১] কৃষি শুমারী ২০০৮ অনুসারে, গ্রামীণ পরিবারের মালিকানায় মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৮.৯ মিলিয়ন হেক্টর। পূর্বের কৃষিশুমারির তুলনায় কিছু সংজ্ঞাগত পরিবর্তনকেই এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

পরিবার (মোট পরিবারের ৪৬ শতাংশ) ছিল ভূমিহীন (জমির মালিকানা ০.২ হেক্টর বা ০.৪৯ একরের কম)। ১৯৯৬-৯৭ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১০ মিলিয়ন (মোট গ্রামীণ পরিবারের ৫৬ শতাংশ) এবং ২০০৮ সালে হয় ১৬ মিলিয়ন (মোট গ্রামীণ পরিবারের ৬৩ শতাংশ)।[২]

- মাঝারি ও বৃহৎ আকারের কৃষি খামার (agricultural holding) ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষি খামারে রূপান্তরিত হচ্ছে। ১৯৯৬ সালে মোট জমির ৪১ শতাংশের মধ্যে পরিলক্ষিত কৃষি খামারগুলোর প্রায় ৮১ শতাংশ ছিল ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামার। ২০০৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮৪ শতাংশে যার আওতাধীন জমির পরিমাণ ছিল মোট জমির ৫০ শতাংশ। এ থেকে বলা যায়, লক্ষ্যভিত্তিক পদক্ষেপ (targeting approach) এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা কৃষি সহায়ক প্রকল্পগুলো কার্যত কোনো ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারবে না কারণ অধিকাংশ কৃষি খামারের আকার ২ হেক্টরের নিচে।

- কৃষিক্ষেত্রে ভূমি মালিকানার অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ বর্গাচাষী জমির মালিক এবং কর্মচারী উভয় ভূমিকা পালন করে থাকে যারা নিজেদের জমি চাষ করার পাশাপাশি অপরের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করে। এক্ষেত্রে বর্গাচাষীরা চাষাবাদের কাজে পারিবারিক সদস্যদের শ্রম এবং নিজস্ব গৃহপালিত প্রাণী কাজে লাগিয়ে সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে পারে। মোট আবাদী জমির মধ্যে বর্গাচাষের আওতায় জমির পরিমাণ ১৯৮৩-৮৪ সালে ছিল ১৭ শতাংশ, যা ১৯৯৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ২২ শতাংশ এবং ২০০৮ সালে আরও বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৭ শতাংশ। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর গ্রাম থেকে শহরে দ্রুত অভিবাসনের ফলে সৃষ্ট জমির মালিকের অনুপস্থিতি (absentee landownership) এবং অকৃষিজ খাতে (non-farm sector) গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি বাংলাদেশে জমি মালিকানার পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

- বাংলাদেশের ভূমির ভোগ-দখলী স্বত্ব (tenurial) ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বর্গাচাষের (sharecropping) পরিবর্তে fixed rent tenancy এবং মধ্যমেয়াদি ইজারা (midterm leasing) ব্যবস্থার প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্গাচাষের আওতায় জমির পরিমাণ ১৯৬০ সালে ছিল ভোগ-দখলী স্বত্বের আওতাধীন মোট জমির ৯১ শতাংশ, যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ১৯৮৩-৮৪, ১৯৯৬, ২০০৮ সালে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৪, ৬২ ও ৩৯ শতাংশ।[৩] বাজার ব্যবস্থায় আর্থ-সামাজিক প্রভাব নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের (agrarian institution) পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে (Hossain 2000)।

---

[২]বাংলাদেশের ভূমি সংস্কারের পুনর্বিন্যাস (redistributive land reform) সম্পর্কে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। ভূমির সর্বোচ্চ মালিকানা ৩.০ হেক্টর নির্ধারিত হলে উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ হয় ০.৯ মিলিয়ন হেক্টর (মোট জমির ১১ শতাংশ), যা ১০ মিলিয়ন ভূমিহীন পরিবারের জন্য অপ্রতুল বিধায় তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে না (Hossain 2000)।

[৩]কৃষকেরা মূলত fixed rent ব্যবস্থায় আধুনিক প্রজাতির ফসল উৎপাদন করে যাতে অতিরিক্ত বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ভোগ করতে পারে। কিন্তু বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল ফসল (rainfed crops) উৎপাদনে কৃষকেরা বর্গাচাষ (sharecropping) ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাতে খরা, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি উভয় পক্ষ বহন করতে পারে।

৩। অতীত খাদ্য ও কৃষি নীতির মূল্যায়ন

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের খাদ্য ও কৃষি নীতির মূল্যায়ন করা যায়। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের আধুনিক উপকরণ প্রচলনের ক্ষেত্রে সরকারি প্রচেষ্টার সূচনা ঘটে ১৯৬০ সালে কৃষি কমিশন এর সুপারিশের মাধ্যমে। ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (East Pakistan Agricultural Development Corporation-EPADC) নামক আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সার, বীজ, কীটনাশক, সেচের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, বিপণন এবং বিতরণের দায়িত্ব EPADC-কে প্রদান করা হয়। EPADC স্বল্প সময়ের ব্যবধানে কৃষকদের নিকট কৃষি উৎপাদন উপকরণ বিতরণের একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। EPADC পরবর্তীতে Bangladesh Agricultural Development Corporation-BADC নামে পরিচিতি লাভ করে। বিএডিসি কৃষি উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহ ও বিতরণে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করলেও বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক প্রণীত বাজার মূল্য এবং নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যতা বিধান করে কার্যক্রম পরিচালনা করত।

৩.১। বাজার উদারীকরণ নীতির পূর্ব সময়ে

বিএডিসি গঠনের সময়ে ব্যাপক হারে রাসায়নিক সার ব্যবহারের প্রচলন শুরু হয়। ১৯৭৭-৭৮ সালে বিএডিসি কর্তৃক বিক্রয়কৃত মোট সারের পরিমাণ ছিল ৭.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন, যার বেশিরভাগই ছিল ইউরিয়া। এ সার প্রথম পরিবহন করা হয় Transit গুদাম এবং থানা বিক্রয় কেন্দ্রে (Thana Sales Centre বা TSC)। টিএসসি খুচরা সার ব্যবসায়ী ও কৃষকদের নিকট সরাসরি সার বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করায় পাইকারী ও খুচরা উভয় বিক্রয়কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে। খুচরা ব্যবসায়ী/ডিলারদের একটি নির্দিষ্ট পরিসীমার বাইরে সার বিক্রয়ের অনুমোদন ছিল না। এক্ষেত্রে ডিলাররা নির্দিষ্ট টিএসসি থেকে সার সংগ্রহ করে সরকার নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের নিকট সার বিক্রয় করত। টিএসসি থেকে বিক্রয়কেন্দ্রের দূরত্বের উপর ভিত্তি করে একটি কমিশন ধার্য করা হতো যা সরকার নির্ধারিত মূল্যের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করা হতো। এই কমিশন বাদে সরকার নির্ধারিত সারের মূল্য সমগ্র দেশে একই থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ ব্যবস্থা পরবর্তীতে মাত্রাতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের কারণে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয় (Ahmed 1999)।

সেচ সুবিধা এবং সেচ পানি সরবরাহ ব্যাবস্থাপনার বিকাশ ঘটেছিল আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রাণাধীনে সরকারি মালিকানা, সমবায়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় সরকারি মালিকানা এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিযোগীতামূলক সেচ ব্যবহারের মাধ্যমে (Osmani and Quasem 1990)। ১৯৫০ সালের শেষার্ধে আধুনিক সেচ ব্যবস্থার সূচনাকালে সরকার ভূ-উপরিস্থ পানি (surface water) ব্যবহারের মাধ্যমে বৃহদায়তন সেচ প্রকল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে নানা অব্যবস্থার সম্মুখীন হয়।

পরবর্তীতে সরকার ক্ষুদ্রতায়ন প্রকল্পের দিকে নজর দেয়; ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারে পাওয়ার পাম্প (power pump) এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি (ground water) উত্তোলনে নলকূপ (tubewells) ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৯৭৯/৮০ সাল পর্যন্ত সেচ যন্ত্রপাতি বিএডিসি এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বাকৃবি)-এর মাধ্যমে বিপণন ও বিতরণ হতো। বিএডিসির আওতায় সকল ধরনের সেচ যন্ত্রপাতি এবং বাকৃবি এর আওতায় ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে অগভীর নলকূপ (shallow tubewells) বিক্রয়

করা হতো। ষাটের দশকে বিএডিসি সেচ পাম্প ও টিউবওয়েল স্থাপন, বিপণন ও রক্ষণাবেক্ষণের একচেটিয়া মালিকানা লাভ করে। বিএডিসি মৌসুমভিত্তিক ভাড়া গ্রহণের মাধ্যমে সেচ পাম্প বিভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠানের নিকট সরবরাহ করে থাকত। সত্তরের দশকে কৃষক সমবায় সংগঠন সেচ যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লাভ করে। এ ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক বিএডিসি মালিকানাধীন সেচ যন্ত্রপাতি বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়ার পূর্ববর্তী সময় (১৯৭৮/৭৯ সাল) পর্যন্ত চালু ছিল।[৪]

সরকার পরবর্তীতে ক্ষুদ্র আয়তনের জমিতে সঠিক সেচ ব্যবস্থাপনা হিসেবে অগভীর নলকূপ এর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে যার ফলস্বরূপ ১৯৮০ সালে বেসরকারিভাবে অগভীর নলকূপ আমদানির অনুমতি প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে আমদানিকারকদের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মান নিয়ন্ত্রণমূলক (specific makes/models) বিভিন্ন নীতিমালা/শর্ত অনুসরণ করতে হতো। দুটি টিউবওয়েলের মধ্যে ন্যূনতম দুরত্ব বজায় রাখা এবং অগভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিমালার অনুসরণেও বাধ্যবাধকতা ছিল। কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির (Structural Adjustment Policies) আওতাধীন বাণিজ্য উদারীকরণ সংস্কার বাস্তবায়নের নিমিত্তে সরকার ১৯৮৬ সালে বেসরকারিভাবে ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক প্রদানের ভিত্তিতে যে কোনো ধরনের (model/make) ডিজেল ইঞ্জিন আমদানির অনুমতি দেয়। ১৯৮৮ সালে প্রণীত কৃষিখাত সমীক্ষার (Agriculture Sector Study) সুপারিশ অনুসারে সরকার ডিজেল ইঞ্জিন আরোপিত আমদানি শুল্ক এবং মান নিয়ন্ত্রকমূলক নীতিমালা/শর্ত প্রত্যাহার করে এবং সরকারি অনুমোদন ছাড়াই সকল ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানির অনুমতি প্রদান করে। ১৯৯০ সালে আমদানি শুল্ক পুনরায় আরোপিত হলেও শুল্কহার ১৯৮০ সালের আমদানি শুল্ক হারের তুলনায় অনেক কম ছিল।

কৃষকদের নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহৃত বীজ উৎপাদন এবং বিক্রয়ের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বীজের বাজার গড়ে উঠেছে। এ বীজ সরবরাহ ব্যবস্থা শুধু দেশীয় কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং তা বাংলাদেশ ও ভারতের কৃষকদের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এছাড়া সরকারি ব্যবস্থাপনায় উন্নত মানের বীজ উৎপাদন বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রসার লাভ করেছে। বিএডিসি বিভিন্ন ফসলের উন্নত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য প্রায় ১২টি বীজ উৎপাদন কেন্দ্র পরিচালনা করে থাকে। বীজের উন্নত মান নিয়ন্ত্রণের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক বীজ সত্যায়ন ব্যবস্থার (seed certification mechanism) প্রবর্তন হলেও অনুন্নত মান ও সঠিক সময়ে দুষ্প্রাপ্যতার জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় উৎপাদিত বীজ অভিযোগের সম্মুখীন হচ্ছে। বিগত সময়ে বিএডিসি উচ্চফলনশীল (HYV) বীজ প্রচলনের জন্য নেদারল্যান্ডের আলু বীজ এবং মেক্সিকোর গম বীজ আমদানি করে। কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়নে কৃষি বীজের উদার বাণিজ্যকরণ ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে।

[৪] বেসরকারি মালিকানায় বিএডিসির সেচ যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণ সেচের পানির মূল্য (water charge) প্রভাবিত করতে পারে এই ধারণায় প্রাথমিকভাবে সমবায় সংগঠনকে এসকল যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হয়। সমবায় সংগঠনকে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে ঋণ সুবিধাসহ, ভর্তুকি ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সমবায় সংগঠন প্রদত্ত এই সকল সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৮৩ সালের মধ্যে বিএডিসির মালিকানাধীন অগভীর হস্তচালিত নলকূপ (Low Lift Pump) এবং গভীর নলকূপের প্রায় ৪০ শতাংশ বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়।

৩.২। কৃষি উপকরণ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার সংস্কার

সার ও সেচের যন্ত্রপাতির উদার বাণিজ্যকরণ (যা সংস্কার নীতির অন্যতম প্রধান উপাদান ছিল) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানায় বাজারজাতকরণ ফলপ্রসূ অবদান রেখেছে। ১৯৮৮ সালে প্রায় আট হাজার পাইকারী বিক্রেতা ও পঞ্চাশ হাজার খুচরা ব্যবসায়ী প্রতিযোগীতামূলকভাবে সারের বাজারে অংশগ্রহণ করেছে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণ বাজারের ক্রমবিকাশ সারণি ৩-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ৩
কৃষি উপকরণের বাজার ব্যবস্থার উদারীকরণের পর্যায়ক্রম

কার্যক্রম	সময়কাল	মন্তব্য
সার বাজার ব্যবস্থা		
১. প্রাথমিক বিতরণ কেন্দ্রগুলোর পাইকারী ও খুচরা বাজার বিএডিসির আওতামুক্ত হওয়া	১৯৭৮-৮৩	চট্টগ্রাম বিভাগে প্রথম বাস্তবায়িত হয়। থানা পর্যায়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায়।
২. লাইসেন্স লাভের বাধ্যবাধকতা এবং যাতায়াতের উপর বিধি নিষিধের অপসারণ (ভারতের সাথে ৫ মাইলের সীমানা ব্যতিত)	১৯৮২-৮৩	"
৩. সারের দামের উপর নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার অপসারণ	১৯৮২-৮৪	প্রতিযোগীতামূলক বাজারের সূচনা
৪. কারখানা এবং বন্দর হতে সরাসরিভাবে সার ক্রয়ের ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যবসায়ীদের অনুমতি প্রদান	১৯৮৯	ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়
৫. বিশ্ববাজার হতে মুক্তভাবে আমদানি	১৯৯২	উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ কিন্তু একচেটিয়া (oligopoly) বাজার ব্যবস্থা বিরাজ করার আশংকা
সেচ যন্ত্রপাতি		
১. বিশেষ ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির কারণে বেসরকারি পর্যায়ে বিএডিসি হতে সকল লো-লিফট পাম্প ক্রয়	১৯৮০-৮২	কৃষকের কাছ থেকে বিপুল সাড়া
২. বিশেষ ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বিএডিসির কর্তৃক সকল নলকূপ কৃষক ও সমবায় সমিতির কাছে বিক্রয়	১৯৮৩-৮৫	কৃষকের কাছ থেকে বিপুল সাড়া
৩. ইঞ্জিন ও পাম্প আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা অপসারণ	১৯৮৮	ইঞ্জিনের দামের ব্যাপক হারে হ্রাস
৪. বিভিন্ন যন্ত্রের আমদানির ক্ষেত্রে বিশেষ মডেলের উপর আরোপিত বিধি-নিষেধ অপসারণ	১৯৮৮	ইঞ্জিনের দামের ব্যাপক হারে হ্রাস
পাওয়ার টিলার, কীটনাশক এবং বীজ		
১. পাওয়ার টিলার আমদানি এবং মান নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি-নিষেধের অপসারণ	১৯৮৯	পরিমিত সাড়া
২. নির্দিষ্ট brand name কীটনাশকের আমদানির বিধির শিথিলকরণ	১৯৮৯	পরিমিত সাড়া
৩. ধান ও গম ব্যতিত অন্য সকল বীজ আমদানির অনুমতি	১৯৯০	পরিমিত সাড়া

উৎস: Ahmed (1999)।

সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল বলে অনুমিত হয়। ১৯৮৯ সালে ৪-৫ হেক্টর জমিতে সেচ কাজে উপযোগী অগভীর নলকূপ এর দাম কমে হয় বিশ হাজার টাকা যা ছিল বিএডিসি কর্তৃক ভর্তুকিসহ নির্ধারিত মূল্যের ৬০ শতাংশের সমান। এর ফলে ১৯৮৮-৯০ সময়কালে সেচকৃত জমির পরিমাণ ১৯৭৮-৮৬ সময়কালের সেচকৃত জমির দ্বিগুণ হয়। উদারীকরণ নীতি বাস্তবায়নের কয়েক মাস পূর্বে পাওয়ার টিলার-এর দাম ছিল ২,৫০০ মার্কিন ডলার, যা ১৯৮৯ সালে কমে দাঁড়ায় ১৫০০ মার্কিন ডলার। পাওয়ার টিলার -এর ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম হলেও

বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে এর দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটেছে। বীজ এবং কীটনাশক দ্রব্যের (pesticides) উদার বাণিজ্যকরণের প্রভাব স্বল্প মেয়াদে কম হলেও দীর্ঘমেয়াদে এর প্রভাব, বিশেষ করে বীজের ওপর প্রভাব, অনেক বেশি হওয়ার উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে (Ahmed 1999)।

৩.৩। বাণিজ্য উদারীকরণনীতির প্রভাব

বাজার উদারীকরণ ব্যবস্থার প্রভাব দুটি উপাদানে ভাগ করা যায়। প্রথমত উৎপাদন উপকরণের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে কৃষিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং দ্বিতীয়ত, ভর্তুকি হ্রাস বা প্রত্যাহারের কারণে বাজেটে সঞ্চয় খাতের পুনর্বিন্যাসের ফলাফলস্বরূপ কৃষি ও অকৃষি উৎপাদনের উপর পরোক্ষ প্রভাব। প্রত্যক্ষ প্রভাব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করার পাশাপাশি ভর্তুকি প্রত্যাহারজনিত পরোক্ষ প্রভাব নিয়ে এখানে আলোচনা করা হবে।

সারের উপর ভর্তুকির পরিমাণ ১৯৭৯/৮০ সালে ছিল ১,২৮৬ মিলিয়ন টাকা (৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ১৯৮৩/৮৪ সালে ছিল ১,৪২৬ মিলিয়ন টাকা (৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ১৯৮৮/৮৯ সালে ১,২৭৩ মিলিয়ন টাকা (৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং ১৯৯২/৯৩ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় মাত্র ২৫ মিলিয়ন টাকায় (০.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। ১৯৮৩/৮৪ ও ১৯৭৮/৭৯ সালে সারের ভর্তুকির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন ব্যয়ের ১৪ শতাংশ ও ২৮ শতাংশ। অতএব সার ভর্তুকি প্রত্যাহারের ফলে বাজেটে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি ছিল উল্লেখযোগ্য। সেচ ব্যবস্থায় ভর্তুকির পরিমাণের এরূপ তুলনামূলক চিত্র পাওয়া সম্ভব হয়নি। ১৯৭৯/৮০ এবং ১৯৮৩/৮৪ সালে বিএডিসির ব্যবস্থাপনায় লো-লিফট পাম্প এবং নলকূপে ভর্তুকির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,০৩৫ মিলিয়ন টাকা (৬৭ মিলিয়ন ডলার) ও ৮৩০ মিলিয়ন টাকা (৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। ১৯৮৬ সালে লো-লিফট পাম্প এবং নলকূপের উপর আরোপিত ভর্তুকি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হয়।

বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থার সংস্কারের প্রভাব পরিমাপ নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণার অভাব রয়েছে। Ahmed (1995) তার গবেষণায় ধানের উৎপাদনের উপর কৃষি উপকরণের বাজার সংস্কারের প্রভাব পরিমাপের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সমীকরণভিত্তিক (multi-equation) মডেল ব্যবহার করে তিনি উপকরণের বাজারে (input market) উদারীকরণ নীতির প্রভাব নিরূপণ করেছেন যেখানে dummy variable-এর মাধ্যমে উদারীকরণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের পার্থক্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৮৪-৯২ সময়কালে সংস্কারমূলক কার্যক্রম ধান উৎপাদন বৃদ্ধিতে ২০ থেকে ৩২ শতাংশ পর্যন্ত অবদান রেখেছে। এই উৎপাদন বৃদ্ধিতে সারের অধিকতর ব্যবহার এবং বেসরকারি পর্যায়ে সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের অবদান ছিল সর্বাধিক। Ahmed (1999)-এর গবেষণা অনুসারে বাংলাদেশের কৃষি উপকরণের বাজারে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে খাদ্যশস্যের স্বল্পতা এবং খাদ্যশস্যের মূল্য উভয়ই বৃদ্ধি পেত।

বাজার উন্মুক্তকরণের প্রভাবের প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণের তুলনায় প্রভাবের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা প্রদানই ছিল পূর্ববর্তী আলোচনার মূল উদ্দেশ্য। বাজার উন্মুক্তকরণের গতি-প্রকৃতি জনিত ভিন্ন মতবাদকে বিবেচনা করে কৃষি নীতি সম্পর্কে ৩টি মূল প্রশ্ন বিতর্কের প্রতিপাদ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে: (ক) কৃষিক্ষেত্রে বাজার সংস্কারজনিত প্রক্রিয়াকে পূর্ণরূপ প্রদানের এবং তা বজায় রাখার জন্য অতিরিক্ত কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন? (খ) কৃষি উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির জন্য কি বাজার

সংস্কারই যথেষ্ট? যদি যথেষ্ট না হয়, তাহলে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি? উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি কি যেকোনো মূল্যে অর্জন বাঞ্চনীয়? (গ) যদি বাজার উন্মুক্তকরণ প্রক্রিয়া পূর্ণরূপ লাভ করে এবং কৃষি বাজার প্রতিযোগীতামূলক বাজার ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়, তবে কি তিন থেকে চার শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব? শুধুমাত্র বাজার ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে চার শতাংশ প্রবৃদ্ধি সম্ভব কিনা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। সাধারণত বাজার সংস্কার প্রক্রিয়ায় মূল্য সম্পর্কিত প্রণোদনার জন্য যোগানের যে এককালীন (one-shot) পরিবর্তন হয়, তা উৎপাদনের ক্ষেত্রে তিন থেকে পাঁচ বছরের স্বল্প বা মধ্যমেয়াদি প্রভাব বিস্তার করে। দীর্ঘমেয়াদি ও ধারাবাহিক উৎপাদন মূলত কাঠামোগত উপাদানের উপর নির্ভর করে যা কৃষি উৎপাদকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়।[৫]

৩.৪। অতীত খাদ্যনীতির মূল্যায়ন

খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহী করে তোলার জন্য ১৯৭০ সালের শেষে সরকার ধান এবং গমের ক্ষেত্রে কৃষকদের জন্য মূল্য সহায়তা (price support) প্রদানের নীতিমালা গ্রহণ করে। (Public Food Distribution System (PFDS)। বিশেষ করে সরকারের খাদ্যশস্য মজুদ সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখাই ছিল সরকার কর্তৃক খাদ্যশস্য সংগ্রহের (public procurement) অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এক্ষেত্রে অপর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল চালের মূল্য স্থিতিশীল রাখা। সরকার বিভিন্ন monetized চ্যানেলের মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করতে থাকে, যেমন: শহরবাসীদের ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ (statutory) রেশন ব্যবস্থা, গ্রামবাসীদের জন্য পরিবর্তিত (modified) রেশন ব্যবস্থা, অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শ্রেণিসমূহের যেমন প্রতিরক্ষা বাহিনী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সরকারি কর্মচারি প্রভৃতির জন্য রেশন ব্যবস্থা।

১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের পরবর্তীকালে non-monetised চ্যানেলের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় খাদ্য সাহায্যের (food aid) মাধ্যমে। "কাজের বিনিময়ে খাদ্য" কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল: (ক) ভূমিহীন কৃষকদের slack season-এ সাহায্য প্রদান ও (খ) গ্রামীণ কাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি। ১৯৮০ সালে আরেকটি non-monetised channel যেমন Vulnerable Group Feeding (VGF) কর্মসূচি চালু করা হয় যার মাধ্যমে মহিলা পরিচালিত (female-headed) পরিবার এবং সহায়-সম্বলহীন (destitute) মহিলাদের মাসিক কোটাভিত্তিক পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচি পরবর্তীতে Vulnerable Group Development (VGD) কর্মসূচিতে পরিণত হয় যেখানে সরকার বিভিন্ন এনজিও সহযোগীতায় দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড এবং রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রয়াস চালায়।

সরকার ক্রমান্বয়ে মুক্ত বাজার মূল্য এবং রেশন মূল্যের ব্যবধান হ্রাস করতে থাকে যা রেশন পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য ক্রয়ের পরিমাণকে উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে দেয়। সরকার রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণের পরিবর্তে মূল্য স্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে খোলা বাজারে বিক্রয় পদ্ধতির (open market sale) প্রচলন করে। দরিদ্র গ্রামীণ ভোক্তার জন্য সরকার ১৯৮৯ সালে modified রেশন

[৫]উৎপাদন উপকরণের বাজারজাতকরণ নীতির সংস্কার মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কেবল এককালীন (once-for-all) প্রভাব বিস্তার করে। মূল্যস্তর সম্পর্কিত এসকল প্রভাব নি:শেষ হলে মূল্যস্তরের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন বিষয় যেমন অবকাঠামো এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন কৃষি প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে প্রধান ভূমিকা পালন করে (Hossain 1996)।

ব্যবস্থার পরিবর্তে গ্রামীণ রেশন ব্যবস্থার (Palli Rationing) প্রবর্তন করে। কিন্তু এ ব্যবস্থা সুবিধাবঞ্চিতদের সাহায্য প্রদানে ব্যর্থ হলে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

"কাজের বিনিময়ে খাদ্য" কর্মসূচি slack season-এ কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উপকৃত করলেও নির্মাণ কাজের নিম্নমান এবং প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে এর উন্নয়নমুখী অবদান ছিল বহুলাংশে সীমিত। রাস্তাঘাট এবং বাঁধের অপরিকল্পিত সম্প্রসারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা ও পানি নিষ্কাশনজনিত সমস্যা ১৯৪৭ এবং ১৯৮৮ সালের বন্যায় দৃশ্যমান হয়। ফলে ১৯৯০ সালে সরকার "কাজের বিনিময়ে খাদ্য" কর্মসূচির পুনর্বিন্যাসে গুরুত্বারোপ করে এবং feeder road নির্মাণ ও ক্ষুদ্রায়ন সেচ প্রকল্প স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এছাড়া সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে "ঝরে পড়া শিশুর" সংখ্যা (drop out rate) কমানোর উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলকভাবে নির্ধারিত থানায় বিদ্যালয় কর্মসূচি গ্রহণ করে যা পরবর্তীতে "শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য" (FFE) কর্মসূচি গ্রহণে ভূমিকা রাখে। এই কর্মসূচির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পরা শিশুর সংখ্যা হ্রাস এবং এদের অপুষ্টি রোধে সহায়তা করা।

নব্বই দশকে খাদ্যশস্যের সরকারি বিতরণ ব্যবস্থার নানাবিধ সংস্কার করা হয়। খাদ্যনীতির কালানুক্রম সংস্কার সারণি ৪-এ দেখানো হয়েছে। সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ কর্মসূচি (public procurement) ও মুক্ত বাজারে বিক্রয় ব্যবস্থার (open market sale) মাধ্যমে মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং এর পাশাপাশি FFW ও VGD কর্মসূচি পরিচালনা করা সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার (PFDS) মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক মূল্যের মাঝে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে খাদ্যশস্য আমদানি ও রপ্তানিতে সরকারি একচেটিয়া প্রভাবের বিলোপ সাধন কার্যকর ভূমিকা রাখে। খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থার সংস্কার ধান এবং অন্যান্য কৃষি পণ্যের মূল্য প্রণোদনা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[৬]

[৬] Shahabuddib and Zohir (1995) এর অপর একটি গবেষণায় দেখা যায়, চালের nominal protection rate and effective protection rate-এর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। অতএব, এ ধরনের প্রণোদনামূলক কার্যক্রমকে পরিমাণগত দিক থেকে না হলেও পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

সারণি ৪
খাদ্যনীতি সংস্কারের কালানুক্রমিক চিত্র

বছর	গৃহীত নীতি
খাদ্যনীতি সংস্কারে দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ	
১৯৭২-৭৪	শহরে রেশন ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার
১৯৭৪	কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির সূচনা
১৯৭৫	ভিজিডি কর্মসূচির সূচনা
১৯৭৮	রেশনের মাধ্যমে প্রদত্ত ভর্তুকির ক্রমান্বয়ে অপসারণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ
১৯৮১	Public Law 480 অনুযায়ী রেশন মূল্য এবং সংগ্রহ মূল্যের সমন্বয়ের মাধ্যমে ভর্তুকি হ্রাসের সূচনা
১৯৮৩	পূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির সূচনা
১৯৮৮	গ্রামীণ এলাকায় Atta Chakti বিতরণ
১৯৮৯	সংশোধিত রেশন ব্যবস্থার পরিবর্তে পল্লী রেশন ব্যবস্থার প্রবর্তন
১৯৮৯	দেশের অভ্যন্তরে খাদ্যশস্যের চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার
১৯৯১	ডিসেম্বর মাসে পল্লী রেশনিং ব্যবস্থার অবলুপ্তি
খাদ্যনীতি সংস্কারে স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ	
মে ১৯৯২	পল্লী রেশনিং ব্যবস্থার অবলুপ্তি
জুলাই ১৯৯২	বেসরকারিভাবে গম আমদানির অনুমতি প্রদান
অক্টোবর ১৯৯২	খাদ্যশস্য ঋণের উপর নিষেধাজ্ঞা বাতিলকরণ
নভেম্বর ১৯৯২	অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ব্যবস্থার প্রবর্তন
নভেম্বর ১৯৯২	মিলগেট চুক্তি বাতিলকরণ
১৯৯২	খাদ্য পরিদপ্তরে কর্মচারির সংখ্যা হ্রাসের প্রস্তাবনা পেশ
১৯৯২	বিধিবদ্ধ রেশনিং-এ চাল বিতরণ স্থগিত
জুলাই, ১৯৯২	বেসরকারিভাবে চাল আমদানির অনুমতি প্রদান
১৯৯৩	বিধিবদ্ধ রেশনব্যবস্থায় গম বিতরণ স্থগিত
১৯৯৩	শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির সূচনা
২০০২	শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির রোহিতকরণ
২০০২	সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা নীতির প্রবর্তন

উৎস: Chowdhury and Hagblade (2000), Ali *et al.* (2008)।

উপরোক্ত পরিবর্তনের ফলাফলস্বরূপ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থার (PFDS) আকার এবং অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। একই সাথে খাদ্যশস্যের মৌসুমভিত্তিক মূল্য ওঠা-নামার (seasonal fluctuation in prices) প্রবণতা হ্রাস পায়, বিশেষ করে বোরো ধান উৎপাদনে ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে। এসকল পদক্ষেপ দেশের খাদ্যশস্যের বাজারে সরকারি প্রভাব ও সম্পৃক্ততাকে কমিয়ে দেয়।

৪। বর্তমান সময়ের খাদ্য ও কৃষি নীতির মূল্যায়ন

৪.১। সূচনা

বাংলাদেশের বর্তমান খাদ্য ও কৃষি নীতি মূলত বিগত খাদ্য ও কৃষি নীতির সম্প্রসারিত রূপ যেখানে নতুন উপাদান সংযোজনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা রক্ষা, গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে বর্তমান সময়ের খাদ্য ও কৃষি নীতির মূল্যায়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে যার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতের ক্রমবিকাশ ও অবদান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত কৃষি ও খাদ্য নীতির সংস্কার (policy reforms) মূলত উৎপাদন উপকরণ (বীজ, সার, সেচ, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং কৃষি ঋণ), উৎপাদিত ফসল (খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ) ও কৃষি উন্নয়নে বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত। কৃষি উপকরণের সরবরাহ প্রক্রিয়ার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার সার, বীজ, কীটনাশক এবং সেচ কাজে ব্যবহৃত ডিজেলের বাজারমুখী বিতরণে উৎসাহ প্রদান করেছে। সাম্প্রতিককালে (২০০৯ এবং ২০১০ সালে) কৃষকের নিকট উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ প্রক্রিয়া জোরদার করার জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে: কৃষকের জন্য কৃষি উপকরণ সহযোগীতা কার্ড প্রদান, কৃষকের ব্যাংক এ্যাকাউন্টে ডিজেল ভর্তুকি প্রদান, বর্ষাকালে অনাবৃষ্টি হলে সেচ কাজে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ, সার সরবরাহে নতুন পদ্ধতি, বর্গাচাষীদের জন্য বন্ধকহীন কার্ড (collateral free card) এবং কৃষি ঋণের সম্প্রসারণ (Hossain and Deb 2011)।

৪.২। সার বাজার সম্পর্কিত নীতি

সারের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ এবং সার সরবরাহ ব্যবস্থায় বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের জন্য বিদ্যমান সার নীতির পর্যালোচনা প্রয়োজন। একই সাথে এই খাত যে সব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তাও বিশ্লেষণ করা দরকার।

সার বাজার ব্যবস্থার বেসরকারিকরণের পর নানাবিধ সমস্যার কারণে সরকার সার ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। সাম্প্রতিককালে সরকার সার সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থায় বিদ্যমান ডিলারশীপ নীতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছে। ডিলারশীপ নীতি ২০০৮ অনুযায়ী উপজেলা ভিত্তিক নিয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তে প্রতিটি ইউনিয়নে কমপক্ষে একজন ডিলার নিয়োগ বাধ্যতামূলক। কিন্তু এ নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যকরী না হওয়ায় ডিলারশীপ নীতি ২০০৯ চালু করা হয়। নতুন ডিলারশীপ নীতিতে ডিলারদের বিক্রয় প্রতিনিধিদের (sales representatives) অপসারণ, ডিলারদের জেলার ভিতরে কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখার উপর শর্তারোপ, খুচরা বিক্রয় পদ্ধতির প্রবর্তন এবং আইডি কার্ডের প্রচলন উল্লেখযোগ্য।

৪.৩। সেচ এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নীতি

সেচ সুবিধা এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থার উন্নয়ন মূলত বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে: আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় সরকারি মালিকানা, সমবায়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় সরকারি মালিকানা এবং প্রতিযোগীতামূলক সেচের বাজার (water market) বিকাশের উদ্দেশ্যে বেসরকারি মালিকানা। ষাটের দশকে সেচ পাম্প ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নলকূপ স্থাপনের ক্ষেত্রে বিএডিসির একচেটিয়া মালিকানা ছিল। বিএডিসি একটি নির্দিষ্ট হারের (flat fee) বিনিময়ে বিভিন্ন সমবায়ভিত্তিক সেচ সমিতিকে সেচ পাম্প মৌসুমভিত্তিক ভাড়া দিয়ে থাকত। বিএডিসি এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১৯৭৯/৮০ সাল পর্যন্ত ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি (minor irrigation) সংগ্রহ/ক্রয় ও বিতরণ করে থাকত। সত্তরের দশকে সমবায় কৃষক সংগঠন সেচের যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লাভ করে। এই ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক বিএডিসি মালিকানাধীন সেচ যন্ত্রপাতি বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়ার পূর্ববর্তী সময় (১৯৭৮/৭৯ সাল) পর্যন্ত চালু ছিল।

সরকার সেচ পাম্প ও নলকূপের ভাড়া বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত ও সমবায় সংগঠনের কাছে বিক্রয় পদ্ধতি চালু রাখলেও সেচ ক্ষেত্রে আশির দশকের শেষ পর্যন্ত পরোক্ষ ভর্তুকির (implicit subsidy) পরিমাণ ছিল ব্যাপক। ১৯৮৮ সাল থেকে সরকার কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানিতে বিধি নিষেধ প্রত্যাহার ও আমদানি শুল্ক হ্রাস করলে অগভীর নলকূপ ক্রয়ের ক্ষেত্রে কৃষকেরা নিজস্ব উদ্যোগে বিনিয়োগ শুরু করে এবং কৃষি ঋণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতিতে প্রদত্ত পরোক্ষ ভর্তুকি হ্রাস পায়।

বিদ্যুৎ ও ডিজেলের মাধ্যমে সেচ ক্ষেত্রে জ্বালানি সরবরাহ দেশের মোট সেচকৃত জমির পরিমাণ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যুতের তুলনায় ডিজেল ব্যবহারের খরচ দ্বিগুণ হলেও অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ ও গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের শ্লথ গতির কারণে কৃষকেরা বিদ্যুতের স্বল্প খরচজনিত সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে না। অপরদিকে ডিজেলের দাম ১৯৯৬-২০০৬ সময়কালে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। ডিজেলের ঊর্ধ্বমূল্য এবং পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাব ভূ-গর্ভস্থ সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে এবং কৃষকের মুনাফা অর্জনের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবি) কর্তৃক পরিচালিত বৃহদায়তন সেচ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে এখন পর্যন্ত ব্যাপক হারে ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ১৯৭৬ সালে পাউবি সেচ সুবিধা প্রদান করার ফলে যে অতিরিক্ত লাভ (incremental benefit) হয় তার মাত্র ৩ শতাংশ water charge হিসাবে চালু করে যা সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করা হলেও পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের মাত্র এক-চতুর্থাংশ পূরণ করবে। কিন্তু এই সামান্য water chargeও বাস্তবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। গবেষণা অনুযায়ী, পাউবির প্রকল্প হতে স্বল্প আয়ের প্রধান কারণ হলো প্রশাসনিক জটিলতা যার মধ্যে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর (beneficiaries) water charge নিরূপণ ও সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অভাব উল্লেখযোগ্য। ১৯৯০ সালের Revised Water Rate Act প্রবর্তনের মূল লক্ষ্য ছিল প্রশাসনিক জটিলতা দূরীকরণসহ সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

BMDA এবং বিএডিসি সম্প্রতি গভীর নলকূপ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণজনিত ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন জেলায় প্রি-পেইড কার্ড সিস্টেম চালু করে। প্রি-পেইড মিটার এবং স্মার্ট কার্ড প্রচলনের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থাপনা ডিজিটালকরণ সম্ভব হয়েছে যা সেচ ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সামগ্রিক দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

বেসরকারি মালিকানায় অগভীর নলকূপের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ সেচ ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। এর ফলে বাংলাদেশে দ্রুত অপ্রাতিষ্ঠানিক সেচের বাজার (informal water market) গড়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের নিকট বৃহৎ মালিকানাধীন কৃষকের সেচ বিক্রয়ের উপর ভিত্তি করে সেচের বাজার গড়ে উঠলেও নলকূপের ব্যাপক সম্প্রসারণ সেচের বাজারে প্রতিযোগীতামূলক দামের (competitive pricing) সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বেসরকারি মালিকানায় সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের সাথে সাথে মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে; crop sharing-এর পরিবর্তে মৌসুমভিত্তিক flat fee এবং পরবর্তীতে flat fee'র পরিবর্তে সময়ভিত্তিক দামের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধিত হচ্ছে। সময়ভিত্তিক দাম (hourly charge) কৃষকদের আমন মৌসুমে পরিপূরক সেচ

ব্যবস্থা (supplementary irrigation) ব্যবহারে এবং আর্দ্র মৌসুমে আধুনিক প্রজাতির ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত করছে। সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ শুধু সব শ্রেণির কৃষকদের উপকৃত করেনি, বরং গ্রামীণ এলাকায় নতুন ধরনের সহায়ক ব্যবসা সৃষ্টির মাধ্যমে বিকল্প জীবিকা (alternative livelihood) প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছে (Hossain and Bayes 2009)।

প্রতিষ্ঠান এবং এর গঠনকাঠামো কোনো জাতির সেচ সম্পদ ব্যবস্থাপনার দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতাকে নির্দেশ করে। একটি দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনার তিনটি প্রধান উপাদান রয়েছে: বৈধ ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো, বাস্তবায়নজনিত প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি এবং সেচ ব্যবস্থার বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহ। বিগত সময়ে সরকার কর্তৃক নানা দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হলেও সেখানে সমন্বয়হীনতা ও প্রায়শ মতভেদ বিদ্যমান ছিল। কৃষি, শিল্প, জ্বালানি, মৎস্য ও পশুসম্পদ, বন, জন-স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন, বন্যা ও খরা নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও নারী সমাজের উন্নয়ন, বিকেন্দ্রীকরণ এবং পানি ব্যবহারে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রসারের জন্য বিদ্যমান জাতীয় লক্ষ্য ও কৌশলের আলোকে বর্তমান সময়ের সকল নীতিমালার পর্যালোচনা প্রয়োজন (Faruquee & Chowdhury 1998)।

বাংলাদেশে পানি ব্যবহারজনিত কোড (Water Codes) সম্পর্কিত আইন ও বিধির যথাযথ বাস্তবায়নে অপ্রতুলতা বিদ্যমান। বর্তমানে বিদ্যমান সেচ সংক্রান্ত বহু নীতির হালনাগাদ করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত মুনাফার প্রবণতা (rent seeking) দূর করার জন্য সতর্কতার সাথে নীতিমালা প্রণয়ন এবং জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার উপর ভিত্তি করে সকল নীতিমালার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। পানি সংক্রান্ত নীতিমালার লক্ষ্য এবং বাস্তবমুখীতা নিশ্চিতকরণে এনজিওদের অংশগ্রহণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রয়োজন। আইনভঙ্গের জন্য শাস্তি বিধানের সুস্পষ্ট বর্ণনা, ব্যাপক প্রচারণা এবং যথাযথ প্রয়োগ প্রয়োজন (Shahabuddin *et al.* 2014)।

৪.৪। অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ কর্মসূচি সম্পর্কিত নীতি

ফসলের বাজারে সরকারি নিয়ন্ত্রণের বিকাশ ঘটে ধান ও গমের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ কর্মসূচি এবং খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে। ধান ও গমের সংগ্রহ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য কৃষকদের সহায়তা প্রদান এবং Public Food Distribution System Gi মাধ্যমে বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা। নব্বই দশকের শুরুতে সরকার চাল সংগ্রহের পরিমাণ হ্রাস করলেও এ দশকের শেষের দিকে তা পুনরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশে মোট উৎপাদিত চালের তুলনায় সরকার কর্তৃক সংগৃহীত চালের পরিমাণ খুবই নগণ্য (মোট উৎপাদিত চালের ৩-৪ শতাংশ, যা মোট উদ্বৃত্ত চালের ৬ থেকে ৮ শতাংশের সমান)। গমের অধিক উৎপাদনের সময় গম সংগ্রহের পরিমাণ ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে গমের উৎপাদন হ্রাসের সাথে সাথে গম সংগ্রহের পরিমাণও কমে গিয়েছে। বিগত বছরগুলোতে সরকার অভ্যন্তরীণ বাজার হতে খুবই সামান্য পরিমাণ গম সংগ্রহ করেছে। সম্প্রতি সরকার বোরো ধান সংগ্রহ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ১৯৯০ সাল হতে খাদ্যশস্যের বেসরকারি আমদানি তেমন কোনো মূল্যবৃদ্ধি ছাড়াই (২০০৭-০৮ সাল ব্যতিত) অপর্যাপ্ত ফলনের সময়কালে ঘাটতি মেটাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু উদ্বৃত্ত ধান রপ্তানির ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। বিগত সময়ে অধিক ফলনের কারণে প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের চালের

দাম মাঝে মাঝে হ্রাস পেলেও আন্তর্জাতিক বাজারের সথে সংযোগের অভাবে এবং ধানের আন্তর্জাতিক মান নিরূপণের (international grading) সঠিক পদ্ধতি না থাকায় ধান রপ্তানি করা সম্ভব হয়নি।[৭]

অধিক ফলনের সময় ধান রপ্তানির বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে সরকারিভাবে উদ্বৃত্ত ধান সংগ্রহ করা। এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং কৃষকদের সহায়তা প্রদান করা সম্ভব।[৮] আভ্যন্তরীণ বাজার থেকে সংগ্রহকৃত চালের সঠিক মূল্য স্থির করা প্রয়োজন, যা কৃষককে উৎপাদনে প্রণোদনা জোগাবে এবং একই সাথে সরকারের খরচ কম রাখবে।

কতিপয় গবেষণা অনুযায়ী, বর্ষাকালে উৎপাদিত আমন ধানের ফলনের হার এবং ভবিষ্যৎ দাম প্রাক্কলনের চেয়ে সেচকৃত বোরো ধানের ফলন ও দাম প্রাক্কলন করা সহজতর। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত মোট তের বছরের মধ্যে নয় বছরেই বোরো ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ৮০ শতাংশের বেশি অর্জিত হয়েছে এবং মাত্র এক বছর অর্জিত হয়েছে ৬০ শতাংশের কম। অপরদিকে আমন ধান সংগ্রহের ক্ষেত্রে ১২ বছরের মধ্যে মাত্র ২ বছরে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৮০ শতাংশ অতিক্রম করেছে এবং ৮ বছরই অন্তত ৬০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাত্রার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। ২০০০ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত মোট দশ বছরে বোরো ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ৮০ শতাংশ অতিক্রম করেছে ৮ বছরে এবং শুধু ২০০৯ সালে ৬০ শতাংশের কম লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। আমন ধানের ক্ষেত্রে ১০ বছরের মধ্যে মাত্র দুই বছরে ৮০ শতাংশের বেশি লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে (Ahmed *et al.* 2010)। নব্বই দশকের শেষের দিকে চার বছরের মধ্যে তিন বছরই ধান সংগ্রহের মূল্য (procurement price) ছিল অত্যাধিক। ফলে তা সরকারের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং সংগ্রহ কেন্দ্রে ধান বিক্রয়কারীদের অত্যাধিক মুনাফার সুযোগ সৃষ্টি করে। অপরদিকে বাজার মূল্যের তুলনায় ধান সংগ্রহের মূল্য অত্যাধিক রাখায় rent seeking behaviour এবং সংগ্রহ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে (Dorosh *et al.* 2004)।

অভ্যন্তরীণ ধান সংগ্রহ কর্মসূচিতে অব্যবস্থাপনা ও অকার্যকারীতার প্রধান কারণ: (১) অধিক ফলনের বছরগুলোতে সরকারিভাবে বেশি খাদ্যশস্য আমদানি গুদামজাতকরণে সমস্যা সৃষ্টি করে যা পরবর্তী বছরে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, (২) ধান সংগ্রহ কেন্দ্রগুলোতে কৃষকদের পর্যাপ্ত অংশগ্রহণের অভাব যা কৃষকদের ব্যবসায়ীদের নিকট স্বল্প মূল্যে বিক্রয়ে বাধ্য করে।[৯] ধান সংগ্রহ ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকের তুলনায় বড় কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণ ছিল

---

[৭]মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্য-ভিত্তিক ব্যবস্থায় অসামঞ্জস্যতা (asymmetry) বিদ্যমান। উৎপাদন ঘাটতির সময় আমদানি সমতা মূল্য (Import Parity Price) যেমন সর্বোচ্চ মূল্যস্তর (price ceiling) বজায় রাখার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে, রপ্তানি সমতা মূল্য (Export Parity Price) সর্বনিম্ন মূল্যস্তর (floor price) বজায় রাখার ক্ষেত্রে তেমন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। রপ্তানি সমতা মূল্যস্তরের কার্যকর না হওয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সংযোগ, আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের সুবিধার অভাব দায়ী। অতএব, কৃষকদের ন্যায্য মূল্য এবং উৎপাদনে প্রণোদনা প্রদানে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

[৮]পূর্বে শুধুমাত্র বিতরণের উদ্দেশ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় খাদ্যশস্য মজুদ রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ কর্মসূচি ব্যবহৃত হতো।

[৯]অন্যান্য সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে: উৎপাদন এলাকাসমূহের তুলনায় পর্যাপ্ত সংগ্রহ কেন্দ্রের (procurement centre) অভাব, সরকারি অর্থসম্পদের সীমাবদ্ধতা, ক্ষুদ্র কৃষকের নিকট হতে যথাসময়ে ক্রয় ও অর্থ প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক বাধা এবং ব্যবসায়ী ও সরকারি কর্মকর্তাদের আঁতাত।

অত্যাধিক (Shahabuddin and Islam 1999)।[১০] সরকারি সংগ্রহ ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কৃষকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং কৃষকদের মূল্য সহায়তা সঠিকভাবে প্রদানের ক্ষেত্রে কতিপয় বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি: (১) ধান সংগ্রহের মূল্য সঠিকভাবে নির্ধারণ এবং তা সঠিক সময়ে প্রচার করা যা কৃষকদের সঠিক নির্দেশনা প্রদান ও সরকারের অর্থের সাশ্রয় করবে (২) ধান সংগ্রহ ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতকরণে উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা (বিশেষ করে আমন মৌসুমে যে সময়ে ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের যথেষ্ট ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়)। অভ্যন্তরীণ ধান সংগ্রহ ব্যবস্থা নির্ভর করে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের ধান সরবরাহের সক্ষমতা ও ইচ্ছার উপর। কোনোরূপ বাধ্যবাধকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে ব্যবসায়ী/মিলার এবং কৃষকদের ধান সরবরাহের সিদ্ধান্ত অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

বিগত বার বছরে ধান সংগ্রহের উপাত্ত সারণি ৫-এ দেখানো হয়েছে। বোরো মৌসুমে ধান সংগ্রহের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য। মোট সংগৃহীত ধানে এ মৌসুমে সংগ্রহের হার ছিল গড়ে প্রায় ৮৫ শতাংশ।[১১] ২০০৪-০৫, ২০০৭-০৮ এবং ২০১০-১১ সালে বোরো মৌসুমে সংগৃহীত ধানের অবদান মোট সংগৃহীত ধানের ১০০ শতাংশ ছিল যখন আমন মৌসুমে কোনো চাল সংগ্রহ করা হয়নি। বিগত বছরগুলোতে ধান সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়নি। ২০০৯-১০ সালে মোট সংগৃহীত চালের পরিমাণ ছিল ১২.১১ লাখ টন যা পরবর্তী বছরেই (২০১০-১১ সালে) হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫.৬৩ লাখ টনে।

সারণি ৫

চালের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ: ১৯৯৯/০০-২০১০/১০

('০০০ টন)

বছর	সরাসরিভাবে সংগৃহীত চাল		সংগৃহীত ধান হতে রূপান্তরিত চাল		মোট চাল
	বোরো	আমন	বোরো	আমন	
১৯৯৯/২০০০	৪৬৪.৫০	২২৪.০৪	৫৭.২৬	১০.১৪	৭৫৫.৯৪
২০০০/২০০১	৪৭৯.৬৩	১৯৯.৩৭	১০৬.৯৯	৩৪.৯৮	৮২০.৯৭
২০০১/২০০২	৫৫২.৮০	১০৩.১৮	৬১.১০	৮.২২	৭২৫.৩০
২০০২/২০০৩	৭৪৫.৫৫	১৮.৩৭	৫১.৯৫	০.৪২	৮১৬.২৯
২০০৩/২০০৪	৬২৯.৩৫	১৩২.৪২	৫৪.৬১	১০.৭৪	৮২৭.১১
২০০৪/২০০৫	৮১৬.৬৫	০.০০	১৮.৩০	০.০০	৮৩৪.৯৬
২০০৫/২০০৬	৮৪৮.৮৫	৮৮.২৮	৭.১৪	০.০২	৯৪৪.৩০
২০০৬/২০০৭	৯৬৯.৫০	১৬২.৮৩	৭.১৩	০.০০	১১৩৯.৪৬
২০০৭/২০০৮	৫৭৪.৮৯	০.০০	২৮.১৭	০.০০	৬০৩.০৬
২০০৮/২০০৯	৬৭৯.০৫	১৫৩.৪৪	৪২.৯৩	৯.০৭	৮৮৪.৪৯
২০০৯/২০১০	১১৩৩.৭৫	১৪.৪৮	৬২.১৯	০.২০	১২১০.৬২
২০১০/২০১১	৫৫৭.১৮	-	৫.৫৭	-	৫৬২.৭৫

উৎস: DGO।

[১০]সমীক্ষায় মোট নমুনার (sample) মাত্র ১০ শতাংশ কৃষক ১৯৯৮ সালে বোরো সংগ্রহের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বড় কৃষক ছিল যথাক্রমে ৫, ১৩ ও ২২ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ কর্মসূচির এরূপ অব্যবস্থাপনার জন্য সরকারি কর্মকর্তা এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যকার আঁতাত, এবং স্থানীয় কমিটির অকার্যকর ভূমিকা দায়ী।

[১১]বোরো ধানের অধিক উৎপাদন ও বাজার উদ্বৃত্ত (marketable surplus) এবং বোরো মৌসুমে চালের বাজার মূল্যের যথাযথ প্রাক্কলন এর প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

কৃষকদের নিকট থেকে সরাসরি ধান সংগ্রহের উপর গুরুত্বারোপ করা হলেও তার বাস্তবায়নের হার ছিল অসন্তোষজনক (সারণি ৬)। মোট সংগ্রহে ধানের অবদান ছিল ১০ শতাংশের কম এবং বিগত বারো বছর সময়কালে (২০০০-২০০১ সাল ব্যতিত) পাঁচ বছরই ধান সংগ্রহের হার ছিল ৫ শতাংশেরও কম। সাম্প্রতিককালে সরকার প্রধানত মিলারদের কাছ থেকে বোরোর মৌসুমে চাল সংগ্রহ করে আসছে।

সারণি ৬

সংগৃহীত ধানের পরিমাণ: ১৯৯৯/২০০০-২০১০/১১

('০০০ টন)

বছর	মোট চালের পরিমাণ	মোট ধানের পরিমাণ	চালের সমতুল্যে ধানের পরিমাণ	চালের সমতুল্যে মোট সংগ্রহের পরিমাণ	মোট সংগ্রহে ধানের পরিমাণ (শতাংশ)
১৯৯৯-২০০০	৬৮৮.৫৪	১০৩.৬৯	৬৭.৪০	৭৫৫.৯৪	৮.৯২
২০০০-২০০১	৬৭৯.০০	২১৮.৪২	১৪১.৯৭	৮২০.৯৭	১৭.২৯
২০০১-২০০২	৬৫৫.৯৮	১০৬.৬৪	৬৯.৩২	৭২৫.৩০	৯.৫৬
২০০২-২০০৩	৭৬৩.৯২	৮০.৫৭	৫২.৩৭	৮১৬.২৯	৬.৪২
২০০৩-২০০৪	৭৬১.৭৬	১০০.৫৪	৬৫.৩৫	৮২৭.১১	৭.৯০
২০০৪-২০০৫	৮১৬.৬৫	২৮.১৬	১৮.৩০	৮৩৪.৯৬	২.১৯
২০০৫-২০০৬	৯৩৭.১৪	১১.০২	৭.১৬	৯৪৪.৩০	০.৭৬
২০০৬-২০০৭	১১৩২.৩৩	১০.৯৭	৭.১৩	১১৩৯.৪৬	০.৬৩
২০০৭-২০০৮	৫৭৪.৮৯	৪৩.৩৪	২৮.১৭	৬০৩.০৬	৪.৬৭
২০০৮-২০০৯	৮৩২.৪৯	৮০.০০	৫২.০০	৮৮৪.৪৯	৫.৮৮
২০০৯-২০১০	১১৪৮.২২	৯৫.৯৯	৬২.৩৯	১২১০.৬২	৫.১২
২০১০-২০১১	৫৫৭.১৮	৮.৫৭	৫.৫৭	৫৬২.৭৫	০.৯৯

উৎস: DGOF।

সারণি ৭ হতে আমন ও বোরো মৌসুমে ধান ও চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা এবং তা অর্জনের হার সম্পর্কে কতিপয় ধারণা পাওয়া যায়। প্রথমত, বোরো মৌসুমে ধান ও চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার আমন মৌসুমের তুলনায় বেশি। দ্বিতীয়ত, বোরো ও আমন উভয় মৌসুমে চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা এবং তা অর্জনের হার ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা এবং তা অর্জনের হারের তুলনায় বেশি। উদাহরণস্বরূপ আমন মৌসুমে ধান সংগ্রহের গড় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০৩ হাজার মেট্রিক টন যেখানে চাল সংগ্রহের গড় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৬১ হাজার মেট্রিক টন। অপরদিকে বোরো মৌসুমেও গড় লক্ষ্যমাত্রা ছিল চালের ক্ষেত্রে ৬৭৫ হাজার মেট্রিক টন এবং ধানের ক্ষেত্রে ১৫৭ হাজার মেট্রিক টন। ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল উভয় মৌসুমে চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার ৩৩ শতাংশ।

অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ কর্মসূচির দুটি মূল উদ্দেশ্য হলো: (১) সরকারি মজুদের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং (২) কৃষকদের উৎপাদন প্রণোদনা প্রদানের উদ্দেশ্যে মূল্য সহায়তা প্রদান। প্রথম উদ্দেশ্য অনেকাংশে পূরণ হলেও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এ পর্যন্ত অধরা রয়ে গেছে। এ উদ্দেশ্য পূরণে প্রধান অন্তরায় হলো অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ব্যবস্থায় কৃষকদের পর্যাপ্ত অংশগ্রহণের অভাব। পূর্বের আলোচনায় দেখা গিয়েছে, কৃষকদের থেকে সরাসরিভাবে সংগৃহীত ধান মোট সংগ্রহের ১০ শতাংশের কম। কৃষকদের ন্যায্য মূল্য লাভ না করার ক্ষেত্রে আরেকটি কারণ হলো মিলার কর্তৃক কৃষকদের সরকারি নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য প্রদান না

করা। দরকষাকষির ক্ষেত্রে এবং প্রচলিত চালের বাজার ব্যবস্থা বহুলাংশে মিলারদের নিয়ন্ত্রণে থাকার ফলে বহুল প্রত্যাশিত "Trickle Down Effect" কার্যকর হচ্ছে না।

সারণি ৭

আমন ও বোরো ধানের ক্ষেত্রে স্থিরকৃত লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জনের হার: ১৯৯৫-২০১০

বছর	আমন				বোরো			
	ধান		চাল		ধান		চাল	
	লক্ষ্যমাত্রা ('০০০ টন)	অর্জনের হার (%)	লক্ষ্যমাত্রা ('০০০ টন)	অর্জনের হার (%)	লক্ষ্যমাত্রা ('০০০ টন)	অর্জনের হার (%)	লক্ষ্যমাত্রা ('০০০ টন)	অর্জনের হার (%)
১৯৯৫	৭৫	০.২২	১৫০	২৭.৬৭	৭৫	৩৩.৮০	২৫০	৬০.৩৬
১৯৯৬	১৫২	৬৬.৫১	১৪৯	৮৯.৯৩	৫৩	৯৪.৯৬	৩৮৫	৯৯.৭১
১৯৯৭	২৭০	০.২০	১২০	০.১৭	২০০	৯৪.৬৫	১২০	১০০.৪২
১৯৯৮	৭৫	০.০৫	২০০	০.০০	২০৩	৩৭.৬০	২৮২	৭৫.৯৯
১৯৯৯	৭৫	২০.৭৯	২০০	১১২.০০	১৫০	১০০.৪৭	৫০০	১০১.৩০
২০০০	৭৩	৭৩.৭৩	২০০	৯৯.৭০	১৫৪	৮৭.২৭	৫০০	১০২.৫২
২০০১	১৪৬	৮.৬৬	১৫০	৬৮.৯৩	১৫৪	৮৪.২৯	৫০০	৮০.৪৪
২০০২	১৪৬	০.৪৫	১০০	১৮.৩৭	১৫৪	৫২.৪৯	৬০০	৯৬.০৭
২০০৩	৭৩	২৩.২৯	১৫০	৮৮.০০	১৫৪	৬৩.৫৩	৭৫০	৯২.০৭
২০০৪	৭৩	০.০০৪	১৫০	০.০০	১৫৪	২৪.৬৬	৭০০	১০৩.২০
২০০৫	৪২	০.০১	১৭৫	৪৭.৫৬	৩৯	৫০.১৩	৯৭৭.৫	৯৩.৯৬
২০০৬	৩৭	০.০১	১৭৫	৯৩.০৩	৩০০	৪.৮৩	১০০০	১০২.৫০
২০০৭	৭৫	০.০০	১৫০	০.০০	৩০০	২.১১	১০০০	৭০.২০
২০০৮	৭৫	১৮.৬১	১৫০	১০২.২৯	৩০০	১৫.৭১	১২০০	৯৪.৭৪
২০০৯	১৫০	০.২১	২০০	৭.২৪	৯৫.৬৬	১০০.০২	১১৩৫.৩২	৯৯.৮৬
২০১০	-	-	-	-	১৫০	৫.৭১	১০৫২	৫৩.০৬

উৎস: FPMU।

অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ কর্মসূচি কৃষকদের কিভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মূল্য সহায়তা প্রদান করছে তার মূল্যায়ন করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় সহায়তার অপ্রতুলতার কারণে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ কর্মসূচিতে কৃষকদের অংশগ্রহণ কম। এর ভিত্তিতে বলা যায়, কৃষকদের প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি।[১২] কিন্তু তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ কর্মসূচি কৃষকদের পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকে। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ কর্মসূচি ধানের বাজার মূল্য সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকদের পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করে। এই কর্মসূচি কৃষকদের

[১২]অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কৃষকের নিরূৎসাহের পেছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে (Shahabuddin and Islam 1999)। সংগ্রহ মূল্য বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি হলেই কৃষক সংগ্রহ কেন্দ্রে বিক্রয় করতে উৎসাহি হবে তা নয়; বরং ফসলের বাজার মূল্য, সংগ্রহ কেন্দ্রে ফসল মানসম্পন্ন ও বিক্রয়ের উপযোগী হিসেবে বিবেচিত না হবার ঝুঁকি এবং সংগ্রহ কেন্দ্রে প্রদত্ত নানা অবৈধ খরচ- এ তিনটি উপাদানের মোট পরিমাণের চেয়ে সংগ্রহ মূল্য বেশি হলেই কৃষক সংগ্রহ কেন্দ্রে বিক্রয়ে উৎসাহী হবে (Sattar and Mandal 2012)।

সরকার নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য প্রদানে ভূমিকা রাখে না ঠিকই, কিন্তু এটা বলা যেতে পারে যে এই কর্মসূচি না থাকলে খামার মূল্য (farmgate price) হয়ত বর্তমান মূল্যের চেয়ে কম হতো।[১৩]

৪.৫। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ সম্পর্কিত নীতি

বেসরকারিভাবে খাদ্যশস্য আমদানি প্রথম শুরু হয় ১৯৯৩ সালে। বর্তমানে আমদানিকৃত ধান ও গমের অধিকাংশ আসে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়। স্বাভাবিক বছরগুলোতে ধান আমদানি হ্রাস পেলেও বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের বছরগুলোতে তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। গমের আমদানি সাম্প্রতিক সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে তিনটি কারণে: (১) গমের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হ্রাস, (২) খাদ্য সাহায্য হিসেবে গমের আমদানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস (এ খাদ্য সাহায্য মূলত গমের মাধ্যমে প্রদান করা হতো যা ত্রাণ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হতো) এবং (৩) শহুরে এলাকায় আটা দিয়ে প্রস্তুতকৃত খাদ্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি। দেশে ডাল, ভোজ্য তেল, মসলা ও চিনি আমদানির পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভোজ্য তেলের আমদানি ১৯৯০/৯১ সালে ১৫৩,০০০ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪/০৫ সালে ৪৩৭,০০০ মেট্রিক টনে এবং ২০০৮/০৯ সালে ৮৬৫,০০০ মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে। গম এবং ডাল আমদানির ক্ষেত্রে এরূপ ধারাবাহিক বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। বিগত দশ বছরে খাদ্যশস্য আমদানি ব্যয় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বর্তমান মোট রপ্তানি আয়ের এক-পঞ্চমাংশের অধিক। আন্তর্জাতিক বাজারে এসকল দ্রব্যমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি অভ্যন্তরীণ মূল্যকে প্রভাবিত করছে, যা স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে খাদ্য-নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সরকার এই সকল শস্য আমদানির পরিবর্তে শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে উৎপাদন নিশ্চিত করবে (Hossain and Deb 2011)।

৫। উপসংহার

বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্র ইতিমধ্যে প্রধান কাঠামোগত রূপান্তরের (structural transformation) মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়েছে। বিগত ত্রিশ বছরে যে সকল নীতিমালা এবং কর্মবিধি গ্রহণ করা হয়েছে, তা মূলত শস্য উৎপাদনকে (বিশেষত ধান ও গম) কেন্দ্র করেই হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে কৃষিনীতিমালারও কৌশলগত পরিবর্তন ঘটেছে। কৃষিক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতার প্রেক্ষিতে বর্তমান নীতিমালা/কার্যকারিতা নিরূপণে সামগ্রিক আলোচনা প্রয়োজন, যাতে কৃষিখাত ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে পারে। এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে ব্যাপক আলোচনা সম্ভব নয়। তাই এখানে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করব।

কৃষির সামগ্রিক উন্নয়নে অন্যতম সমস্যা হলো প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা, বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী জমির অপর্যাপ্ততা। বর্তমানের কৃষিজ জমির অকৃষিজ ব্যবহার ক্রমান্বয়ে

[১৩] Ahmed *et al*. (১৯৯৩) পরোক্ষ প্রভাবকে সমর্থন করেছেন কেননা অধিকাংশ কৃষক বাজারে বিক্রয় করে থাকে; এক্ষেত্রে সংগ্রহ কর্মসূচি মূলত বাজার মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে যা উৎপাদকের প্রণোদনা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। Sattar and Mandal (2012) দেখিয়েছেন যে খামার মূল্য (farmgate price) এবং সংগ্রহ মূল্যের মধ্যে উচ্চ (০.৬৩) সংশ্লেষাংক (correlation) বিরাজ করে। সংশ্লেষাংক থেকে কোনো কারণ এবং প্রভাব (cause & effect) সম্পর্ক ধারণা করা যায় না বলে ধানের খামার মূল্যের উপর সংগ্রহ মূল্যের নির্ভরাংক (regression) হিসাব করা হয়। বস্তুত এ গবেষণা হতে দেখা যায় যে সংগ্রহ মূল্য যদি ১ টাকা বৃদ্ধি পায়, তাহলে বিগত বছর এবং বর্তমান বছরের বাজার মূল্যের পার্থক্য বৃদ্ধি পায় ১.১৩ টাকা।

বৃদ্ধি পাচ্ছে যা মূলত ব্যক্তিগত খাতে মুনাফা অর্জনের জন্য করা হচ্ছে। জমির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে বিদ্যমান অপচয় যথাযথ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে রোধ করা সম্ভব। উপকূলীয় অঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে অনাবাদী জমিতে প্রয়োজনীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব।

উপরোক্ত আলোচনার সাথে সম্পর্কিত আরেকটি বিষয় হলো ক্রমবর্ধমান কৃষিকাজের প্রেক্ষিতে মাটির উর্বরতা এবং পানির গুণগত মান রক্ষা করা। বাংলাদেশে শস্য নিবিড়তা (cropping intensity) ইতিমধ্যে ১৭৫ শতাংশ অতিক্রম করেছে যা বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। পানির সীমিত ব্যবহার এবং ফসলের পুষ্টির (nutrients) নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই ফসল উৎপাদন এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন কৃষি গবেষক এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কৃষিক্ষেত্র থেকে অধিক উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন অকৃষিজ ক্ষেত্রে শ্রমগোষ্ঠীর স্থানান্তর কোনো উদ্বেগের কারণ হতে পারে না বরং তা দারিদ্র্য হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আশা করা যায়। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমগোষ্ঠীর এ স্থানান্তর বিবেচনা করে কৃষকরা উৎপাদন পদ্ধতি পরিচালনা করছে। সরকার কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকায়নকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি ঋণ বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য অর্থায়ন এবং বাণিজ্যনীতিতে বিদ্যমান জটিলতা ও বিচ্যুতি (distortions) নিরসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

"কৃষির বহুমুখীকরণ" কৃষি উন্নয়নে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এ ব্যাপারে সরকারের সহায়তা প্রয়োজন। খাদ্য চাহিদার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ কৃষি পরিকল্পনায় মৎস্য উৎপাদন ও পশুসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।[১৪] মৎস্য উৎপাদনে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো চাষকৃত মৎস্য (culture fisheries) উৎপাদন এবং মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের (open water capture fisheries) মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। বাংলাদেশে অব্যবহৃত বিশাল জলজ ভূমির (floodplains) পরিকল্পিত ও যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। এ ব্যাপারে বৃহৎ কৃষক ও মৎস্যজীবীর সাথে ভূমিহীন ও দরিদ্র মৎস্যজীবীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ শুধু মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, অধিকন্তু দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। দেশের এনজিওরা এই কর্মকাণ্ডে ইতিমধ্যে সরকারকে সহযোগীতা প্রদান করছে যা আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

পশুপালন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাণিজ্যিক উৎপাদন এবং উপজীবিকা-নির্ভর (subsistence-oriented) পশুসম্পদ উন্নয়নের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। বাণিজ্যিকভাবে পশু উৎপাদন সম্প্রসারণে বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা নেই মূলত পর্যাপ্ত চারণক্ষেত্রের অভাব এবং পশুখাদ্য আমদানিজনিত অধিক ব্যয়ের কারণে। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে হাঁস-মুরগি (poultry)

[১৪]মৎস্য এবং পশুপালন উপখাতের দ্রুত উন্নয়ন শস্য উৎপাদনের অনুপযোগী এলাকার এবং সুবিধাবঞ্চিত মানবগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমতা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখতে পারে। গভীর জলাভূমি এবং লবণাক্ত উপকূলীয় অঞ্চলে (যা সবুজ বিপ্লবের আওতার বাইরে রয়েছে) ধান-মাছ উৎপাদন পদ্ধতি (rice-fish cropping system) গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে পারে, বিশেষ করে দেশের স্বল্পোন্নত এলাকায়।

উৎপাদনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে এনজিওদের সহায়তায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বাড়ি-সংলগ্ন জমিতে উপজীবিকা-নির্ভর পশুপালনের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। উপজীবিকা-নির্ভর পশুপালন পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হলো নারী ও শিশুদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়জনিত সুবিধা এবং শস্য উৎপাদনের বিভিন্ন উপজাত দ্রব্যের (by-products) পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার। এনজিওরা পশু পালন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঋণসুবিধাসহ বাজারজাতকরণে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে এনজিও-সরকার এর অংশীদারত্ব (partnership) আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থায় ধান সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে আসছে। খাদ্যশস্যের ঘাটতি মেটানোর পর ধানের পরিবর্তে অন্যান্য লাভজনক শস্য উৎপাদনে গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। বিভিন্ন গবেষণা অনুযায়ী, অভ্যন্তরীণ সম্পদের ব্যয় অনুপাত (domestic resource cost ratio) অনুসারে কিছু আমদানিকৃত ফসল ব্যতিত (যেমন আখ, তৈলবীজ, মসলা) অধিকাংশ ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) বাংলাদেশে বিদ্যমান। এ সকল ফসল উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা (ফসল সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, আর্থিক সহায়তা) গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা প্রয়োজন।[১৫]

কৃষির বহুমুখীকরণে অধিক গুরুত্বারোপ করার অর্থ এই নয় যে খাদ্যশস্যের উপর সরকারি সহায়তা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে। ধান ও গমের উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা শুধু খাদ্যশস্যের চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য নয় বরং অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজন। তাই এ উদ্দেশ্যে "উপকরণ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি" পদ্ধতির পরিবর্তে "উপকরণের সুষ্ঠু ব্যবহার ও কার্যকারিতার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি" পদ্ধতির আলোকে সরকারের প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সেচ কাঠামোর সম্প্রসারণ এবং সেচকৃত জমির পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের সীমিত সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পরিবর্তে বিদ্যমান সেচ সুবিধার যথাযথ ব্যবহার অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

কৃষি উপকরণের উপর ভর্তুকি প্রদানের যৌক্তিকতার পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই ভর্তুকি প্রত্যাহারের ফলে সরকারের অর্থসম্পদের সাশ্রয় হবে। ভর্তুকি প্রদানে ব্যবহৃত না হয়ে এই অর্থসম্পদ গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন (যা উৎপাদন উপকরণ ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মুনাফা অর্জনে সহায়তা করে), public goods এর সরবরাহ বৃদ্ধি (উদাহরণস্বরূপ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের মূল্য সম্পর্কিত নির্দেশনা/তথ্য প্রদান) এবং উন্নত প্রযুক্তির প্রসারে (যা বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে কৃষিক্ষেত্রে মূলধনের যোগান বৃদ্ধি করতে পারে) ব্যবহৃত হতে পারে।

সরকারি সহায়তা প্রদানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হলো কৃষি গবেষণা। নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ, তথ্য সংগ্রহ এবং তা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সরকারি পদক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। ভূমির স্বল্পতার প্রেক্ষিতে শস্য উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা নির্ভর করবে কৃষি-ভিত্তিক গবেষণার উপর সরকারি উদ্যোগের উপর, যা আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তা ব্যবহারের মাধ্যমে চাষাবাদ পদ্ধতিকে উন্নত করে তুলবে। চাল এবং গম উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তি

[১৫]গ্রামীণ এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন মৎস্য ও পশু সম্পদ উপখাতের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের ব্যয় হ্রাস করবে যা এসকল ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে পারে।

ব্যবহারের কারণে ডাল এবং তৈলবীজ উৎপাদনে মুনাফা হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগীতা এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ (broad-based) কৃষি গবেষণা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

ভূমি সংস্কারে সরকারি সম্পৃক্ততা এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ ও নীতিমালা বাস্তবায়নে ব্যর্থতা সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থায় বিদ্যমান বৈষম্যের প্রধান কারণ। বিভিন্ন সময়ে ভূমি সংস্কারের নানা নীতিমালা ও পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত হলেও তা কাগজেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, বাস্তবায়নে রূপ নেয়নি। ভূমি সংস্কারে প্রশাসনিক জটিলতা, ভূমি মালিকানার অব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য কারণে ভূমি সংস্কার কোনো ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারেনি।

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গবেষণা অনুযায়ী, ভূমি মালিকানা বর্তমানে আয়ের অন্যতম উৎস নয় বরং শিক্ষার প্রসার এবং পুঁজির মালিকানা আয় বৈষম্য বৃদ্ধিতে ভূমি মালিকানার তুলনায় অধিক ভূমিকা রাখছে। এর প্রেক্ষিতে বলা যায়, ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস এবং ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান প্রশাসনিক জটিলতা নিরসন (ভূমি সংক্রান্ত দলিল/তথ্যের কম্পিউটারাইজেশন) এ দু'য়ের মধ্যে কোনটি অধিক অর্থবহ তার যথাযথ মূল্যায়ন প্রয়োজন।

উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তির প্রেক্ষিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) নীতিমালা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। বাংলাদেশ বিভিন্ন নীতিমালার মাধ্যমে এসকল সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে কৃষির উন্নয়ন ঘটাতে পারে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ শুল্ক, রপ্তানি ভর্তুকি এবং কৃষিতে সরকারি সহায়তা হ্রাস সম্পর্কিত নীতির আওতামুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশ bound tariff ২০০ শতাংশ রাখার ঘোষণা দিলেও বাস্তবে ব্যবহৃত শুল্কের হার (operating tariff) অনেক কম। কৃষিক্ষেত্রে পরোক্ষ সহায়তার এবং বাজার ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে এরূপ মূল্য সহায়তার পরিমাণ খুবই কম এবং সরকারি সহায়তার পরিমাণ খুবই নগণ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সকল নীতিমালার আওতায় থেকেও কৃষিক্ষেত্রে সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে। বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে (দ্রুত বর্ধমান আমদানি বাজার), আনুভূমিকভাবে (horizontally) (রপ্তানি পণ্যের প্রসার), এবং উলম্বভাবে (vertically) (রপ্তানি পণ্যের মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি), বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করতে পারে। হিমায়িত খাদ্য, শুষ্ক মাছ, চা এবং সবজি রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ SPS সুবিধা ব্যবহার করতে পারে। আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে SPS এবং TBT ব্যবহার করতে পারে। এর মাধ্যমে কৃষিপণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত এবং সুরক্ষার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে অভ্যন্তরীণ বাজারের সমন্বয়, পণ্যের উচ্চ মূল্য এবং অন্যান্য নতুন সুবিধা লাভ করা সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জি

Ahmed, A. et. al. (2010): *Income Growth, Safety Nets and Public Food Distribution*, report prepared for and presented in Bangladesh Food Security Investment Forum, 26-27 May, Dhaka.

Ahmed, R. (1999): "Assessment of Past Agriculture Policies," Chapter 3 in Rashid Faruquee (ed.) *Bangladesh Agriculture in the 21st Century*, The University Press Limited, Dhaka.

——(1995): "Liberalisation of Agricultural Input Markets in Bangladesh: Process, Impact and Lessons," *Agricultural Economics*, 12:2.

Ahmed, R. et al. (1993): "Determination of Procurement Price of Rice in Bangladesh," Working Paper No. 6, IFPRI, Washington, D.C.

Ali, A.M.M. Shawkat (2008): "Public Food Distribution System in Bangladesh: Successful Reforms and Remaining Challenges," Chapter 5 in S. Rashid et al. (eds.) *From Parastatals to Private Trade: Lessons from Asian Agriculture*, Oxford University Press, New Delhi.

BBS (Bangladesh Bureau of Statistics), *Census of Agriculture and Livestock*, Vol. 1 to Vol. 6, 1983-84.

——(2008): *Census of Agriculture*, Vol. 1 to Vol. 3, National Series.

—— (1996):*Census of Agriculture*, Vol. 1 to Vol. 3.

——(various years): *Statistical Yearbook of Bangladesh*, BBS, Dhaka.

Chowdhury, T.E. and S. Hagblade (2000): "Dynamics and Politics of Policy Change," Chapter 9 in R. Ahmed et al. (eds.) *Out of the Shadow of Famine: Revolving Food Markets and Food Policy in Bangladesh*, The Johns Hopkins Univesity, Baltimore and London.

Dorosh, P., Q. Shahabuddin and N. Farid (2004): 'Price Stabilization and Food Stock Policy' in P. Dorosh et al. (eds.) *The 1998 Floods and Beyond: Towards Comprehensive Food Security in Bangladesh*, The University Press Limited and the International Food Policy Research Institute, Dhaka and Washington, D.C.

Faruquee, R. and Y. Chowdhury (1998): "Improving Water Resources Management in Bangldesh," Chapter 11 in Rashid Faruquee (ed.) *Bangladesh Agriculture in the 21st Century*, The University Press Limited, Dhaka.

Hossain, M. (2000): "Recent Development and Structural Change in Bangladesh Agriculture: Issues for Reviewing Strategies and Policies, Changes and Challenges," in *A Review of Bangladesh's Development 2000*, Centre for Policy Dialogue and The University Press Limited.

——(1996): "Agricultural Policies in Bangladesh: Evolution and Impact on Crop Production," in A. Abdullah and A. R. Khan (eds.) *State, Market and Development: Essays in Honor of Rehman Sobhan*, The University Press Limited, Dhaka.

Hossain, M. and A. Bayes (2009): *Rural Economy and Livelihoods: Insights from Bangladesh*, A.H. Development Publishing House, Dhaka.

Hossain, M. and U.K. Deb (2011): "Crop Agriculture and Agrarian Reforms in Bangladesh: Present Status and Future Options," Chapter 1 in M.K. Mujeri and Shamsul Alam (eds.) *Background Papers of Sixth Five Year Plan 2011-2015, Vol. 2, Economic Sectors*, Bangladesh Institute of Development Studies and General Economics Division, Planning Commission, Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

MoF (2011): *Bangladesh Economic Review*, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh.

Ministry of Food and Disaster Management (2008): *The National Food Policy Plan of Action (2008-2015).*

Osmani, S. R. and M. A. Quasem ((1990): *Pricing and Subsidy Policies for Bangladesh Agriculture*, Research Monograph No. 11, BIDS, Dhaka.

Sattar, M.N. and M. A. S. Mandal (2012): "An Empirical Evaluation of Government Paddy and Rice Procurement Programmes in Bangladesh: Policy Implications for Food Security," paper presented at the 18th Biennial Conference of Bangladesh Economic Association, 13-15 September, Dhaka.

Shahabuddin, Q. and K.M. N. Islam (1999): "Domestic Rice Procurement Programme in Bangladesh: An Evaluation," FMRSP Working Paper No. 8, International Food Policy Research Institute, Washington D.C.

Shahabuddin, Q. and S. Zohir (1995): "Projections and Policy Implications of Rice Supply and Demand in Bangladesh," BIDS papers for IRRI/IFPRI project on Rice.

Shahabuddin, Q. et al. (2014): *Economics of Water Resources Management in Bangladesh*, report prepared under Policy Research and Strategy Support Program (PRSSP) implemented by BIDS in collaboration with IFPRI and supported by USAID.